# শিশুস্বাস্থ্য ও হাম : নতুন বাস্তবতা

## পরীক্ষিৎ চৌধূরী

প্রথমেই একটি আশ্বস্ত হওয়ার মত স্বস্তি জাগানিয়া একটি সংবাদ দিয়ে লেখাটি শুরু করছি। দেশে খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়া হবে। তবে যেসব জেলায় টিকা না নেওয়ার হার তুলনামূলক বেশি, এমন ছয়টি জেলায় ৬ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের এই টিকা দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি টিকা কেনার জন্য ৬০৪ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। যত দ্রুত সম্ভব এই টিকা দেশে আনার চেষ্টা করা হবে। এই সময় বরাবরের মতোই ইউনিসেফ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংকট যে কোনো সময়ে আসতে পারে—মানবসৃষ্ট হোক বা প্রাকৃতিক। মূল বিষয় হলো, জনগণের জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে সরকার কত দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়, তা দেখা দরকার। নির্বাচনের মত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়ে বর্তমান সরকারের মেয়াদ মাত্র দেড় মাস পূর্ণ হলো। এর মধ্যেই জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে শিশুস্বাস্থ্যের জন্য একটি অস্বস্তিকর খবর শোনা গেল যে, দেশে হামের প্রকোপ বেড়েছে। যদিও এই আকস্মিক সমস্যার জন্য বর্তমান সরকার দায়ী নয়, তারপরও পরিস্থিতি উত্তরণে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর শিশুদের টিকা দিতে সহায়তা করে সরকারি-বেসরকারি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য অংশীদারত্ব জোট ‘গ্যাভি’। এই গ্যাভির কাছে সরকার সাহায্য চেয়েছে এবং গ্যাভিও দ্রুত সাড়া দিয়েছে। বিশেষ এই কর্মসূচির জন্য টিকা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম তারাই সরবরাহ করছে। এই কর্মসূচির জন্য গ্যাভি ইতিমধ্যে দুই কোটি হামের টিকা দিয়েছে। সিরিঞ্জসহ অন্যান্য সরঞ্জামও দ্রুত পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে গ্যাভি।

এর কিছুদিন পরই শুরু হবে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি, যেখানে হামের টিকা দেওয়ার বয়স আগের মতোই ৯ মাস থাকছে। সাধারণত দেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় শিশুদের ৯ মাস ও ১৫ মাস বয়সে দুই ডোজ হামের টিকা দেওয়া হয়। দেশে এই টিকা নেওয়ার হার ৯০ থেকে ৯২ শতাংশ। তাই সাধারণত প্রতি চার বছর পর পর বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ এই কর্মসূচি হয়েছিল ২০২০ সালে।

সম্প্রতি দেশে হামের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের হাম বেশি আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার এই বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে। হামের এই প্রকোপ বাড়ার কারণ অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ। এসব সংক্রমণ দেশের ভেতর থেকে নাকি বাইরে থেকে ছড়িয়েছে, তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে (আইইডিসিআর)।

হাসপাতালগুলোর সূত্রমতে জানা গিয়েছে, দেশে আক্রান্ত হাম রোগীদের ৩৪ শতাংশের বয়স নয় মাসের কম। যেহেতু এখন বিভিন্ন এলাকায় হাম ছড়িয়ে পড়েছে, এতে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় কোনো বাচ্চা যদি সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে নিশ্চিতভাবে এসে যায়, সেক্ষেত্রে ছয় মাস বয়সি শিশুকেও বিশেষ বিবেচনায় টিকা দেওয়া যেতে পারে। তাই সরকার বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়ে বয়স কমিয়ে ছয় মাস বয়সি থেকে হামের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হাতে নিয়েছে। নিয়মিত টিকাদানের বয়সসিমার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনার আগে সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই আপাতত নিয়মিত কর্মসূচিতে হামের টিকা দেওয়ার বয়স ৯ মাসই থাকছে।

হামের টিকার ঘাটতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ইপিআই পরিচালক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, মাঠপর্যায়ে এখনো টিকা রয়েছে, তবে তা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই নতুন টিকা আনার উদ্যোগ নিবে সরকার। বিশেষ কর্মসূচির জন্য আনা টিকাগুলো ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে গ্যাভিকে চিঠি দিয়েছে সরকার। পরে যখন নিয়মিত ব্যবহারের জন্য টিকা কেনা হবে, তখন এগুলো প্রতিস্থাপন করে নেওয়া হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে আইসিইউ চালু, ভেন্টিলেটর সরবরাহ ও বিশেষায়িত ওয়ার্ড প্রস্তুত করেছে সরকার। টিকা সংগ্রহ প্রক্রিয়াও দ্রুত এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। মহাখালীতে বন্ধ থাকা আইসিইউ ইউনিট চালু করা হয়েছে। রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে শিশুদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড, আইসোলেশন সুবিধা ও ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ ও রাজশাহীতেও নতুন ভেন্টিলেটর পাঠানো হয়েছে এবং আরও ২০টি ভেন্টিলেটর সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
হামে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি তার আশেপাশের ১২ থেকে ১৮ জনকে সংক্রমিত করতে পারে। এটি মূলত হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, টিকা না নেয়া বা দুর্বল ইমিউনিটির শিশুদের ক্ষেত্রে হাম মারাত্মক আকার নিতে পারে। হামের জটিলতা হিসেবে পরবর্তী সময়ে প্রায়ই নিউমোনিয়া ও মারাত্মক ডায়রিয়া হতে পারে। শিশু শরীরে ভিটামিন এ–এর মাত্রা মারাত্মকভাবে কমে যায়। এছাড়া মধ্যকর্ণের ইনফেকশন, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে সংক্রমণও দেখা যায়। অন্যদিকে, টিকা নেয়া শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত বিশ্রাম, পর্যাপ্ত তরল এবং ভিটামিন-এ এর সহায়তাতেই রোগ সেরে যায়। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সাধারণত শরীরে র‍্যাশ ওঠার পরই মানুষ রোগটি শনাক্ত করতে পারে। তবে বাস্তবে র‍্যাশ দেখা দেওয়ার ৩–৫ দিন আগেই সংক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যেই আক্রান্ত ব্যক্তি আশপাশের অনেকের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাম নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দ্রুত শনাক্তকরণ ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ। শুধু র‍্যাশ ওঠার জন্য অপেক্ষা করলে অনেক ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যায় এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
হাম সাধারণত ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়। শুরুতে লক্ষণগুলো খুব সাধারণ মনে হলেও কিছু বিষয় খেয়াল করলেই আলাদা করা সম্ভব। যেমন- হালকা থেকে মাঝারি জ্বর, শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখ লাল হওয়া ও পানি পড়া, শরীর দুর্বল লাগা। এই লক্ষণগুলোর ২–৩ দিনের মধ্যে দেখা দিতে পারে ত্বকে লালচে র‍্যাশ, যা প্রথমে মুখে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যখনই কোনো শিশুর মধ্যে জ্বর, কাশি বা সর্দির মতো প্রাথমিক উপসর্গ দেখা যাবে, তখনই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখতে হবে। পাশাপাশি গলা ব্যথা, শুকনো কাশি, চোখ লাল হওয়া (কনজাংক্টিভাইটিস) এবং চোখ থেকে পানি পড়ার মতো লক্ষণও দেখা দিতে পারে। এসব উপসর্গ অনেক সময় সাধারণ ঠান্ডা-জ্বর হিসেবে ধরে নিয়ে অবহেলা করা হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঝুঁকি বিবেচনায়, সাধারণ সর্দি-কাশির মতো উপসর্গ দেখা গেলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। আক্রান্ত শিশুর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শিশুকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে রাখতে হবে এবং দৌড়ঝাঁপ বা অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম থেকে দূরে রাখা উচিত। এছাড়া চিকিৎসকদের মতে, হামের সময় শরীর দুর্বল হয়ে পড়ায় শিশুকে পর্যাপ্ত তরল ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া প্রয়োজন। পানি, স্যুপ, ডাবের পানি, নরম ও সহজপাচ্য খাবার এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ ফলমূল শিশুর সুস্থতা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ ধরনের উপসর্গযুক্ত শিশুদের অন্যদের সংস্পর্শে যেতে না দেওয়ার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমানো যায়। তাইশিশুকে আলাদা রাখতে হবে। হাম খুব সহজেই ছড়ায়।

এছাড়া পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হচ্ছে। বিশেষ করে হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার- যেমন মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে কাশি দেওয়া, রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করা এবং বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস- শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

#

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস বরিশাল

পিআইডি ফিচার